চর্চিকা

(সনৎ ঠাকুর সিরিজ)

সুপর্ণা নাথ

সূচিপত্র

পাষাণময়ী ♦ ৭

নশ্বর কৃত্য ♦ ২১

চর্চিকা ♦ ৫১

পাষাণময়ী

লেখকের জীবনে সুখ কম, স্বাচ্ছন্দ্য তো আরও কম। তবে আমার মতো ঝাড়া হাত-পা মানুষের একটা পেট; ছাত্র পড়িয়ে আর আমার দূরদর্শী বাবার ব্যাংকে জমানো আমানতের সুদে দিব্যি চলে যায়। বাবা বোধহয় বুঝেইছিলেন, তাঁর সুপুত্র খুব একটা করেকম্মে খেতে পারবে না। তবে আমার ঠাম্মা বলতেন "কাঞ্চন দাসের হাটে দাদুভাই না হয় আমার কলমদাসই হল, ক্ষতি কি?"

ঠাকুরদার বাবার, চুঁচুড়া চন্দননগরের মাঝামাঝি অখ্যাত ভৈরবপুরে বানানো গঙ্গা ঘেঁষা এই শরিকি বাড়ির ছাদটা আছে মাথার ওপর, আর কীই-বা চাই একটা জীবন বাঁচতে! একশো বছর আগে ভৈরবপুরের যেটুকু জেল্লা ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাগর্ভের মতো তাতেও পলি জমেছে। মানুষজন জীবন-জীবিকার টানে ক্রমে শহরমুখী হওয়ার ফলে ভৈরবপুর অতীতের সম্পন্ন জনপদের কঙ্কাল আর আমার মতো কিছু "করে কম্মে না খেতে পাওয়া" অতীত আঁকড়ে থাকা জ্যান্ত প্রেতদের সম্বল করে টিকে আছে।

লেখাটা অনেকটা আমার মনের খিদে। ওই যে পরিচিতির লোভ। মনে হয় যেদিন ফুরিয়ে যাব সেদিন এই লেখাগুলোই কোথাও না কোথাও থেকে গিয়ে

আমাকে হারিয়ে যেতে দেবে না। কিন্তু ওই যে লেখকের জীবনে সুখ নেই বললাম। প্লট খুঁজতে আর জীবনের গল্প থেকে রসদ খুঁজে বের করতে বেশ খাটনি।

মাঝে মাঝে মগজ উত্তর দিয়ে দিলে গঙ্গার এই ভাঙা ঘাটটায় এসে বসি। এদিকে মানুষজন কম, শান্তি পাই। দু'চারদিন যাবৎ দেখছি একজন ভবঘুরে ধরনের মানুষ এখানে ডেরা করেছে।

পোশাক সাধারণ বা বলা ভালো একটু মলিনই। কাঁধে একটা পুরোনো শান্তিনিকেতনি ঝোলা। পায়ে সস্তার রাবারের চপ্পল। ঈষৎ এলোমেলো সাদা-কাঁচা চুল। কারোর সঙ্গে কখনও কথা বলতে দেখিনি বা কোনো সাহায্য বা ভিক্ষা কোনোটাই চাইতেও দেখিনি।

নিজের মতো চুপচাপ জলের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে বসে থাকেন। তবে ওই মলিন মুখ খানায় চোখ দুটো যেন অদ্ভুত উজ্জ্বল। ও চোখের চাহনির দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না যেন মনের ভিতর পর্যন্ত পড়ে ফেলে। মাঝেমধ্যে বার কয়েক চোখাচোখি হয়েছে। দু'তিন দিন এমনি চোখাচোখির পর সেদিন হঠাৎ নিজেই আমার উদ্দেশ্য বললেন,

"একটু আগুন হবে?"

"কী! ...ওহ... হ্যাঁ..."

বলে দেশলাই বাক্সটা বাড়িয়ে দিলাম।

বিড়িটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বাক্সটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন,

"মনে এত প্রশ্ন পুষে রাখতে নেই, উগরে দিন, শান্তি পাবেন।"

খানিক হক চকিয়ে গেলাম, দুটো কারণে এক বাচনভঙ্গির স্পষ্টতা ও কণ্ঠস্বরের গভীরতা। মানুষের উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গি শুনে তার সম্পর্কে বেশ কিছুটা আঁচ করা যায়। লোকটাকে দেখে এমন কণ্ঠ আর ভাষার পরিচ্ছন্নতা হয়তো আশা করিনি। মনে মনে নিজের কাছেই লজ্জিত হলাম, প্রচ্ছদ দিয়ে কখনও বইয়ের সারবত্তা বা মান বিচার্য নয় সেই ইংরেজি প্রবাদটা মনে পড়ে গেল।

ভাব জমাতে দেরি হল না। নাম বললেন,

সনৎ ঠাকুর।

নশ্বর কৃত্য

"রুদ্র বাড়ি আছো নাকি হে?"

গত পাঁচ মাসে এই কণ্ঠস্বরটি আমি কেন আমার বাড়ির শরিক এমনকি আমার ছাত্রদেরও চেনা হয়ে গেছে। ঠাকুর কখন কীভাবে যে এতটা আত্মিক হয়ে গেছেন কে জানে। মাঝেমধ্যেই কোথায় চলে যান, তখন বেশ ফাঁকা লাগে। বুঝি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। টানটা এখন আর শুধু গল্পের প্লটকেন্দ্রিক একদমই নেই।

শেষ কার্তিকের ঠান্ডাটা আমাকে কিছুটা কাবু করেছে বটে, হালকা জ্বরের জন্য দিন কয়েক বাড়ির বাইরে বেরোইনি।

হাসি মুখে বেরিয়ে এসে বললাম,

"আরে আসুন আসুন, একটু বসুন ছাত্রদের আর একটু পরই ছুটি। আসছি আমি বসুন।"

"বসব না এখন, এই নাও ধরো তো..."

একটা ছোটো শিশি দিলেন হাতে,

"চারটে বড়ি দিনে তিন বার, হালকা গরম জল দিয়ে খেলে ভালো...মনে করে খেও কিন্তু।"

অবাক হয়ে বললাম,

"ও এ তো দেখছি হোমিওপ্যাথি ওষুধ, আমি ভাবলাম কোনও ঠাকুরের ফুল বা বিভূতি হয়তো...!"

"হা হা হা...চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেও একটা বস্তু হয় আর সেটা ফুল, বিভূতির থেকে অনেক বেশি কার্যকরও বটে, জাগগে মনে করে খেয়ে নিও, আমি বিকেলে খবর নিয়ে যাব।"

উনি বেরোতে উদ্যত হলেন, আমি পিছু ডেকে বললাম,

"কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে আমার জ্বর..."

কথাটা শেষ করতে পারলাম না উনি মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু অদ্ভুত হাসলেন। যাওয়ার আগে একটু থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন তারপর বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম সেদিকে তাকিয়ে। এই নিয়ে তিন বার! উনি কী সত্যিই সব বুঝতে পারেন নিজেই? সব অব্যক্তই কী ওঁর কাছে বাঙ্ময়!

সেদিন বিকেলে আমার পড়ানো ছিল না, দুপুর থেকেই ঠাকুরের পথ চেয়ে বসে আছি। দু'পুরিয়া ওষুধেই বেশ চাঙ্গা বোধ করছি। সাড়ে চারটে নাগাদ রোদটা একটু পড়ে আসতেই মেইন দরজার শব্দে বুঝলাম ঠাকুর আসছেন।

"রুদ্র আছো নাকি হে..."

বলে চিরাচরিত হাঁক পেড়েই ভিতর উঠোনে পা দিলেন সনৎ ঠাকুর।

হাতে একটা মাঝারি সাইজের ঠোঙা। দোতলার বারান্দা থেকে মুখ ঝুকিয়ে বললুম,

"আপনি আবার এসব কী আনলেন?"

"দাঁড়াও দাঁড়াও উপরে তো আসতে দাও..."

আমি চায়ের জল চাপালুম। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঠাকুর ওপরে উঠে আসছেন।

"এই নাও ঘাটের পাশের দোকানটায় গরম ভাজছিল, নিয়ে এলুম, তোমার জ্বরের জিভে ভালো লাগবে।"

খুলে দেখলাম খান ছয় সাত সিঙ্গারা। একটু লজ্জিত হয়েই বললাম,

"আপনি এসব আবার... কেন ঠাকুর?"

"হা হা হা... আহা ওতে তো আমিও ভাগ বসাব।"

চায়ের কাপ আর সিঙ্গারা একটা পাত্রে গুছিয়ে নিয়ে বাইরের ঘরের চৌকিতে গুছিয়ে বসলাম। শুরু হল নানা বিষয় গল্প। একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম ঠাকুর বারবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে আমার অংশের (বাড়ির) উলটো দিকের পিসিমণির ঘরগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন।

এ বাড়িটা দোতলা। বাইরের উঠোন পেরিয়ে ভিতর বাড়ি। বাড়ির মাঝে একটি বড়ো সান বাধানো উঠোন আর সেই উঠোনের তিনদিকে ঘিরে বাড়িটা। নীচের তলায় আমার দুই জ্যাঠতুতো দাদার অংশ। একজনকে অংশ তালা বন্ধ। তারা কলকাতায় থাকে। আর একজনের অংশে ভাড়াটে থাকে।

উপরের তলায় আমি আর পিসিমণি (বাবার খুড়তুতো বোন)। পিসিমণির ব্যারাকপুরে বাড়ি। পিসেমশাই রেলে ছিলেন গত বছর অবসর নিয়েছেন। ঝাড়া হাত পা জীবন। মাঝেমধ্যে আসেন কয়েকদিন থেকে সাফ সুফ করে আবার চলে যান। কালই পিসিমণি আর পিসেমশাই এসেছেন।

কথার মাঝে বারবার আনমনা হতে দেখে বললাম,

"ঠাকুর, কী হয়েছে বলুন তো?"

উনি একটু আনমনা হয়ে বললেন,

"উম...না কিছু না, সামনের ঘরের দিদি আছেন কি?"

"পিসিমণি? কালই এসেছেন তো, কেন কী হয়েছে?"

"নাহঃ কিছু না..."

কথাটা বলেই যেন সাড়ে ফিরলেন ঠাকুর আর বিষয়টা ঘোরানোর জন্যই বোধহয় হালকা হেসে বললেন,

"এখন কিছু বললে তা খাড়া করতে যে পরিমাণ যুক্তি দরকার তা যে আমার কাছে নেই..."

কথাটা বলেই উঠে বেসিনে হাতটা ধুয়ে আমার মাথায় হাত রেখে কী যেন বিড় বিড় করলেন।

"কী... কী হয়েছে?"

"কিছু না...আর কিছু যাতে না হয় তার জন্যই...ঈশ্বর করুন আমি যেন ভুল প্রমাণিত হই। ও বাদ দাও তুমি। তবে কোনো দরকার বোধ করলে খবর দিও।"

এই কয় মাসে ঠাকুরকে ভালোই চিনে গেছি। তাই ওঁর হঠাৎ এ জাতীয় ব্যবহারে অবাক হই না আর। আর এটাও জানি ওঁর প্রতিটা কথা বা কার্যের পিছনে অবশ্যম্ভাবীভাবে কিছু কারণ থাকবেই। তবে এটাও জানি ঠাকুর থাকলে চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুর পুনরায় চা সিঙ্গারায় মন দিয়েছেন। আগে আগে ওঁর এমন কথায় বেশ অবাক হতাম এখন হই না, আগেই বললাম কিন্তু ভবিষ্যৎ যে এতটা চমক জমিয়ে রেখেছে তার গর্ভে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

***

দিন চার পাঁচ কেটেছে, ঠাকুরের দেওয়া হোমিও ওষুধে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি। কিন্তু এই কয়দিন বাইরে তেমন যাওয়া হয়নি। আসলে পিসিমণি যখন এ বাড়িতে আসেন আর যে কয়দিন থাকেন আমি মায়ের মতো শাসন আর আদর দুটোই খুব উপভোগ করি। এক প্রকার পিসিমণির বারণেই বাইরে যাওয়া হয়নি। তবে আজ অনুমতি পেয়েছি।

দুপুরের দিকে ঘাটে গিয়ে দেখলাম সেই নির্দিষ্ট জায়গায় ঠাকুর বসে আছেন। পাশটায় গিয়ে বসলাম। অন্য দিন একমুখ হাসি নিয়ে স্বাগত জানান কিন্তু আজ ওঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

"কিছু হয়েছে ঠাকুর, চিন্তিত দেখাচ্ছে?"

"না হে, হয়নি তবে বোধহয় হবে...মঙ্গলময় রক্ষা করুন।"

চিন্তামিশ্রিত উদাস কণ্ঠে বলা কথাগুলো অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেলেন সনৎ ঠাকুর। আমার মনে একটু খটকা লাগল।

সেদিন বেশি কথা হল না। শুধু বললেন,

"চোখ কান আর অন্তরাত্মা খোলা রাখবে। চোখ আর কানের বাইরেও একটা অনুভবের পৃথিবী আছে। যাকে তোমরা বলো Gut feeling, instinct সেটাকে অগ্রাহ্য করবে না।"

মনের খটকাটা আরও গাঢ় রং ধরছে।

আমি উঠে চলে আসার আগে একটা কাগজ হাতে গুঁজে দিলেন, একটা নম্বর।

"কার নম্বর?"

"আমার। দরকারে ফোন করো।"

মারাত্মক অবাক হয়ে বললাম,

"আপনার ফোনও আছে! আপনাকে দেখে..."

গঙ্গার ঢেউয়ে চোখ রেখে স্তিমিত স্বরে মাঝ পথে আমাকে থামিয়ে বললেন,

"সে তোমার অনুমান ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।"

"না মানে সেটা না, আপনিই তো বললেন সংসারের মায়া ত্যাগ করেছেন..."

"হুম করেছি কিন্তু সংসার হয়তো এখনও আমায় ত্যাজ্য করেনি।"

কথা না বাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

বাড়ি ফিরে পিসিমণির কাছে খবর পেলাম গুড্ডির শ্বশুরমশাই গত হয়েছেন। হার্ট অ্যাটাক্ট। গুড্ডি পিসিমণির মেয়ে আমার বোন। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। বাগবাজারে শ্বশুরবাড়ি। গুড্ডির সঙ্গে আর সৌম্য মানে গুড্ডির স্বামীর সঙ্গে কথা হল।

পিসেমশাইয়ের জ্বর, শরীর ভালো নেই তাই আমি বললাম আজ না হয় আমিই যাচ্ছি। তোমরা কাল যেও। গুড্ডি, সৌম্যও তাতে মত দিল। বেরোতে একটু দেরি হল। যেতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগে সন্ধের সময় জ্যামজটও বেশ ভালোরকমের থাকে। গুড্ডিকে ফোনে জানিয়ে দিলাম একটু দেরি হবে। পৌঁছোতে সাড়ে আটটা বাজল।

গুড্ডির শ্বশুরবাড়িটাও বেশ বনেদি আর পুরোনো। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা, সাবেক কালের বিশাল কাঠের দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো। একটু অবাক হলাম এই অবস্থায় বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই যাতায়াত করছে কিন্তু দরজা বন্ধ কেন। বাড়ির সামনের রাস্তায় আলোটা বোধহয় খারাপ। আধো অন্ধকারের অর্ধস্বচ্ছ পর্দা যেন বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। আশ্চর্যভাবে বাড়ির ভিতরে থেকেও তেমন শব্দ আসছে না। কীরকম একটা অস্বস্তি মনে হচ্ছে। নিজের ভাবনাগুলোকে শাসন করে আমি দরজাটা খোলার জন্য হাত বাড়ানো মাত্রই দরজাটা শব্দ করে আপনিই খুলে যায়, মিথ্যে বলব না ক্ষণিকের জন্য একটু চমকে গেছিলাম। দু'পা পিছিয়ে আসি। একজন লোক ভিতর থেকে

চর্চিকা

হেমন্তের শেষ বিকেলগুলো কেমন যেন মন কেমনিয়া হয়। গঙ্গার জলটা যখন পড়ন্ত সূর্যের সোহাগ মেখে লালাভ হতে থাকে মনটা কেমন যেন উদাস হয় আমার। আজ না, এখন না, বরাবর। হয়তো সেই ছোটোবেলা থেকেই। সাঁঝ বিকেলের মিলনসীমা বা গোধূলি বেলাতে আমার মন বড্ড খারাপ হয়। কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই হয়, কেন জানি না। আসলে জীবনের ব্যস্ততায় আর অভ্যাসে মনের ভিতর ঘরগুলো তো ঠিক করে ঘুরেই দেখা হয় না। তথাকথিত ভালো থাকার কারণগুলো জীবনে ঠিকঠাক সাজানো থাকলে মন খারাপ আবার কী! আর কেনই বা? আসলে প্রথাগত বাঁধাধরা কারণের বাইরেও যে মন খারাপ হয় বা হতে পারে এটা আমরা নিজের কাছেই স্বীকার করতে পারি না বা হয়তো চাই না।

আজকের মন খারাপের একটা লাগসই কারণ অবশ্য খুঁজে পেয়েছি, আমার আসলে মন কেমন করছে। সনৎ ঠাকুরের জন্য। গত পাঁচ মাস যাবৎ ওঁর কোনও খোঁজই নেই। মাঝে অবশ্য বার দুই নিজেই ফোন করেছিলেন। ব্যাস এটুকুই। ওঁকে ফোন করলে প্রায় সবসময়ই ফোন সুইচ অফ বলে। প্রথম প্রথম অবাক হয়েছি, পরে বুঝেছি ওঁর মতো ছাঁচ ভাঙা মানুষের কাছ থেকে লৌকিক নিয়মের ছাঁচে ফেলা ব্যবহার আশা করা ভুল। তবে মানুষ তো অভ্যাসের দাস।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সম্পর্কের মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে ভালোবাসি বা বলা ভালো অভ্যস্ত। কিন্তু ঠাকুর তো আমার মতো না, উনি স্নেহ ভালোবাসায় অন্যকে বাঁধতে পারলেও নিজে বাঁধা পড়েন না। আসলে অভ্যাস, আমি হয়তো অল্প সময়েই সনৎ ঠাকুরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিভিন্ন অজানা বিষয় আলোচনা। ওঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতাগুলো শোনা, আর সব থেকে বেশি ওঁর আন্তরিক অসম বয়সি বন্ধুত্ব, এসবেই বড্ড অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর তাই হয়তো ওঁর অনুপস্থিতি এতটা মনকে বিকল করছে। একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে মনে মনে বিড় বিড় করলাম

"সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।"

এই তো গতবছর নভেম্বরে পিসিমণির মেয়ে গুড্ডির বাড়ির বিষয়টা হল। নশ্বর কৃত্য কথাটা ঠাকুরের কাছেই প্রথম শুনেছিলাম তখন। তাও প্রায় বছর ঘুরতে চলল।

"তোর মন খারাপ? নাহ খুনের সম্পর্কের কারুর জন্য না। তোর জীবনে কেউ একজন আছে, তার জন্য? তোর বাপ তোর জন্য সব গুছিয়ে গেছে, তোর ছাত্ররাও তোকে ভালোবাসে পরন্তু তুই খুশ না!"

আচমকা কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিজাতীয় বাংলা উচ্চারণে রীতিমতো চমকে উঠলাম। গাছের ছায়ার জন্য ঘাটের এদিকটা গোধূলিতেই সন্ধের আঁধার মাখা। চোখ সইয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে শব্দ উৎপাদনকারীকে দেখার ও চেনার চেষ্টা করলাম। আমাকে বেশি খাটতে হল না। সে নিজেই এগিয়ে এল আমার কাছে, সামনে যাকে দেখলাম তার উচ্চতা মাঝারি, মাথার ওপর মাথার থেকে প্রায় দ্বিগুণ আকারের জটাজুট। পরনে কালো ধুতি আর চাদর। গলায় প্রচুর পরিমাণে রুদ্রাক্ষ আরও নানাবিধ পুঁতির মালা। কাঁধে কালো কাপড়ের পোটলা। হাতে একটা ছোট্ট ত্রিশূল। মুখ ও দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা আর কপালের ফাঁকটুকু পূরণ করেছে দু'টাকার কয়েনের সাইজের একটি কালো টিপ।

"আপনি আমাকে কিছু বলছেন?"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

"হাঁ, তোকেই, ইধার আয়।"

আমি খানিক কৌতূহলবশতই লোকটির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

"বলুন?"

"মন অশান্ত আছে? কেন আছে? তোর তো আগে পিছে কেউ নেই। চিন্তা কাহে কা? উসকা সায়া তো এক সাল আগেই সরে গেছে।"

দৃঢ় কণ্ঠে এবং উচ্চ গ্রামে কথাগুলো বললেন সামনের ব্যক্তিটি।

"কে আপনি এসব...এসব কি বলছেন?"

"হামি সর্বজ্ঞ, তোর ছোটোবেলায় একবার তুই মরতে মরতে বেঁচেছিলি, তোর মা শিউজির কাছে বলেছিল যে তুই বেঁচে গেলে উনি সারা জিউয়ান আম খাবেন না। কি তাই তো?"

এবার সত্যি অবাক হই। আমার মা সত্যি আম খেতেন না। ঠাম্মা বলেছিলেন বটে যে মায়ের প্রিয় ফল মা ত্যাগ করেছিলেন আমার জন্য। কী নাকি মানত ছিল। কিন্তু সে-কথা তো আমরা ছাড়া কেউ জানত না। মা কাউকেই কারণটা বলতেন না।

আমার চিন্তার মাঝেই কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল,

"তবে তোর সামনে সময়টা আচ্ছা না আছে...।"

ঘটনার আকস্মিকতায় হোক বা মনের খানিক বিকল অবস্থার জন্যই হোক এতক্ষণ লোকটির কথাগুলো শুনে একটু অবাক ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,

"আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বুঝে নেব...আপনি আসুন এবার।"

কথাটা বলেই লোকটিকে পাস কাটিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম।

"তোর বাঁয় জেবে একটা ৫০০ রূপিয়ার নোট আছে আর ডান জেবে দুটো ২০০-র নোট আর একটা কাগজ এর চিরকুট।"

আমার পা দুটো অবাধ্যের মতো আপনিই দাঁড়িয়ে গেল। চূড়ান্ত অবাক হয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম,

"কি...কী করে..."

গর্ব আর অহংকার মেশানো হাসি হেসে বলল,

"কহে থে না আমি সর্বজ্ঞ আছি। শুন তোর সামনে বড়ো ফাঁড়া আসছে, এটা কেটে গেলে তুই রাজা হবি বেটা, এদিকে আয় দেখি তোর লালাট মে কি লিখা আছে।"